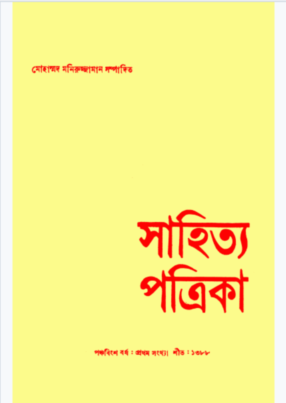

Vol. 25 | No. 1 | 1981

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সৈয়দ সুলতান : জন্মস্থান এবং সময়

Volume	25
Issue	1
Year	1981
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মযহারুল ইসলাম
Published online	December 1, 1981
DOI	10.62328/sp.v25i1.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v25i1.4
Pages	54-64
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সৈয়দ সুলতান : জন্মস্থান এবং সময়

মযহারুল ইসলাম

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নির্মিত হয়েছে অনেকগুলো 'যদি, কিন্তু এবং সম্ভাবনার' উপর ভিত্তি করে—বিশেষ করে প্রাচীন এবং মধ্যযুগের বহুক্ষেত্রে এ কথা সত্য। তাই চণ্ডীদাস সমস্যা, কৃত্তিবাসের স্থানকালগত সমস্যা ; মালাধর বসুর পৃষ্ঠপোষক কোন্ সুলতান এ-সমস্যা, সগীরের সময়কালের সমস্যা, ইত্যাদি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। অনেক কবি সম্পর্কেই অভ্রান্ত প্রমাণ-পঞ্জী আমাদের হস্তগত হয় নি। আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ সযত্ন সতর্কতায় ইতিহাসগত তথ্যসমূহ রক্ষণ করেন নি—অনেক সময় সতর্কতা সত্ত্বেও আবহাওয়ার কারণে বা কীটের প্রকোপে প্রাচীন উপাদান বিনষ্ট হয়েছে। তাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস অনেকটা আকস্মিকতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যদি নেপালে না যেতেন, যদি বাঁকুড়ার গোশালায় শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের পুঁথিটি আকস্মিকভাবে বসন্তরঞ্জনের হস্তগত না হতো তাহলে ইতিহাস অন্যরূপ হতো, সন্দেহ নেই। এসব ছাড়া ইতিহাস প্রণেতাদেরও শুধুমাত্র বস্তুগত ও তথ্য নির্ভর দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব বহুক্ষেত্রে সমস্যাকে আরো জটিল করেছে—কারো প্রবণতা আলোচ্য কবিকে প্রাচীনতার দিকে ঠেলে নিতে, কারো আধুনিকতার দিকে, কারো বা বিশেষ বিশেষ আঞ্চলিকতার প্রতি। পূর্ণাঙ্গ ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবও অনেক সময় বেদনা-জনক ভাবে পীড়াদায়ক। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে অনেক ভার এবং দায় থেকে মুক্ত করা প্রয়োজন।

'নবীবংশ', 'জ্ঞানপ্রদীপ', 'পদাবলী', এবং 'জয়কুম্ রাজার লড়াই' কাব্যগুলোর রচয়িতা সৈয়দ সুলতানকে নিয়েও একটি সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সৈয়দ সুলতান সম্পর্কে যাঁরা প্রথম আলোচনায় অগ্রসর হন, তাঁদের মধ্যে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের নাম উল্লেখযোগ্য। "কবি সৈয়দ সুলতান" এই শিরোনামে তিনি একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন ১৩৪১ সালের ২০শে আশ্বিন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে। প্রবন্ধটি ১৩৪১ বঙ্গাব্দে বা সালে সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় (ত্রৈমাসিক) একচত্বারিংশ ভাগে প্রকাশিত হয়। ডক্টর হক সৈয়দ সুলতানের আত্মপরিচয়-জ্ঞাপক অংশটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করে প্রমাণের প্রয়াস পান যে, কবি চট্টগ্রাম জেলার পরাগলপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। আত্মবিবরণীতে পরাগলপুর বলে কোন গ্রামের উল্লেখ সৈয়দ সুলতান করেন নি, উল্লেখ করেছেন "লস্করের পুরখানি" অর্থাৎ লস্করপুর গ্রামের নাম। ডক্টর এনামুল হকের মতে পরাগল খান ছিলেন হুসেন শাহের লস্কর এবং এই লস্কর নামেই তিনি অধিক পরিচিত ছিলেন, বিধায় কবির উল্লেখিত লস্করের পুর আসলে পরাগলপুর ; যা কিনা চট্টগ্রামের একটি গ্রামের নাম। ডক্টর হকের এই সিদ্ধান্ত যে অনুমান মাত্র, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই আরেকজন বিদগ্ধ পণ্ডিত এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করলেন। ১৩৫১ সালে সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় ৫১-শ ভাগ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যায় 'কবি সৈয়দ সুলতান' এই শিরোনামে অধ্যাপক শ্রী যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য বলেন যে, শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমায় তরফ পরগণায় লস্করপুর নামক একটি গ্রাম আছে এবং এই গ্রামের সৈয়দ বংশ বেশ প্রাচীন ও বনেদী বংশ বলে খ্যাত। ১২৯৪ বঙ্গাব্দে

লস্করপুরের সৈয়দ বংশের সৈয়দ আবদুল আগফার চৌধুরী "তরফের ইতিহাস" নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রন্থে সৈয়দ বংশের 'বংশলতা' আছে এবং সেখানে সৈয়দ সুলতান যে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন তার উল্লেখও রয়েছে। সুতরাং অধ্যাপক ভট্টাচার্য মনে করেন, সৈয়দ সুলতানের আত্মবিবরণীতে যে "লস্করের পুরখানি আলিম বসতি, মুক্রি মূর্খ আছি এক সৈয়দ সন্ততি" বলা হয়েছে, সেখানে অনুমানের কোন অবকাশ নেই। কবি শ্রীহট্টের উক্ত গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেন। এছাড়া অধ্যাপক ভট্টাচার্য সৈয়দ সুলতানের একটি পদাবলী থেকেও উদ্ধৃতি দিয়েছেন :

অজপা পঞ্চশব্দ করি ভালে।
শ্রীহট্ট নগরে বাজএ একতালে॥
কহে সৈয়দ সুলতানে মনে হাঙ্কারি।
পন্থ দাতা ছোলতান পরম ভিখারি॥

শ্রীহট্ট নগরের এই স্পষ্ট উল্লেখ থাকায় সৈয়দ সুলতান যে শ্রীহট্টের লস্করপুর গ্রামেরই অধিবাসী ছিলেন, সেই দাবী আরো জোরালো হয়েছে বলে শ্রী ভট্টাচার্য মনে করেন।

আশা করা গিয়েছিল যে, ডক্টর আহমদ শরীফ "সৈয়দ সুলতান, তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ" শীর্ষক যে গবেষণা গ্রন্থটি লিখে পিএইচ. ডি. অর্জন করেন, সেখানে ডক্টর এনামুল হক ও অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের মত-বিরোধের একটি সদুত্তর দেবেন। কিন্তু তিনি তা দেন নি, বরঞ্চ তাঁর স্বভাবসুলভ পাণ্ডিত্য-গর্বী ভাষায় সৈয়দ সুলতানের জন্মভূমি সংক্রান্ত আলোচনার প্রারম্ভেই ডক্টর শরীফ এইবাক্যে তাঁর বক্তব্য শুরু করেছেন, "সৈয়দ সুলতান যে চট্টগ্রামের চক্রশালাবাসী ছিলেন, তা আজকাল আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।" (ড: আহমদ শরীফ, "সৈয়দ সুলতান, তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ," বাংলা একাডেমী, ঢাকা, নভেম্বর, ১৯৭২, অগ্রহায়ণ ১৩৭৯, পৃ. ৪৮)। অবশ্য আলোচনাটি সমাপ্তির পূর্বে তিনি বলতে বাধ্য হয়েছেন, "সৈয়দ সুলতান সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার লস্করপুরবাসী ছিলেন বলে দাবী করেন মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন সাহিত্যরত্ন ও অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। কিন্তু আমাদের পরিবেশিত তথ্য তাঁদের দাবী সমর্থন করে না।" —(ড: আহমদ শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯-৬০)।

ডক্টর শরীফের পরিবেশিত তথ্য যে যথেষ্ট নয় এবং তাঁর বক্তব্য যে জোরালোভাবে প্রণিধানযোগ্য হয়নি, একথা প্রমাণের প্রয়াস পেয়েছেন মুহম্মদ আসাদ্দার আলী তাঁর "সিলেটের মহাকবি সৈয়দ সুলতান" প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি সিলেট একাডেমী পত্রিকার ১৩৮৬ সালের বৈশাখ সংখ্যায় (এপ্রিল-মে ১৯৭৯) প্রকাশিত হয়। আলোচনাটি বেশ সুদীর্ঘ এবং যুক্তিনির্ভর। অবশ্য ডক্টর এনামুল হক ও ডক্টর শরীফের মধ্যে যেমন সৈয়দ সুলতানকে চট্টগ্রামবাসী প্রতিপন্নের একটি প্রবণতা আছে, তেমনি দুর্বলতা লক্ষণীয় জনাব মুহম্মদ আসাদ্দার আলীর লেখায়—সৈয়দ সুলতানকে সিলেটের লোক প্রমাণ করা চাই। তাছাড়া জনাব আলী সিলেটকে শ্রীহট্ট বলতে যেন কুণ্ঠিত, অথচ আমরা জানি খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দীর মহারাজা শ্রীচন্দ্রের পশ্চিম-ভাগ তাম্রলিপিতে লিখিত আছে, "শ্রীহট্ট মণ্ডল সাতলবর্গ সম্বন্ধ আবেড়িকা সমেত" অর্থাৎ শ্রীহট্ট মণ্ডল বা বিভাগ অতল বা গভীর হ্রদ শ্রেণী সমাকীর্ণ উপকূলীয় দ্বীপসহ—এখানে শ্রীহট্ট নামের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। আনুমানিক খ্রীস্টীয় ৬০০ অব্দে ও জলন্ধর বাধবধূ প্রতিষ্ঠিত মহাদেব মন্দিরে উৎসর্গ লিপিতে আছে— "শ্রীহট্টাবিল্বরভ্যঃ।" সুতরাং শ্রীহট্ট নামটি বেশ প্রাচীন। পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হলেও সৈয়দ সুলতানের সময়েও এই নাম যে ছিল তা তাঁর গানেই উল্লিখিত।

ডক্টর আহমদ শরীফ তাঁর গবেষণাগ্রন্থে চট্টগ্রামের কিছু কবির নামোল্লেখ করেছেন যাঁরা সৈয়দ সুলতানের প্রসঙ্গ তাঁদের কাব্যে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করেছেন। যেমন শেখ মুতালিব তাঁর "কিফায়তুল মুসল্লিন" শাস্ত্রকাব্যে বলেছেন :

নবীবংশে যে সকল প্রমাণ আছএ।
পুথি তাক লিখিবারে উচিত না হএ।।

শেখ মুতালিব নবীবংশ পড়েছেন, কিন্তু নবীবংশের রচয়িতা সৈয়দ সুলতান একথা যেমন বলেন নি, তেমনি এ কাব্যের রচয়িতা যে চট্টগ্রামের অধিবাসী তারও কোন উল্লেখ নেই। শেখ মুতালিবের পিতা ছিলেন শেখ পরাণ, তিনিও কবি ছিলেন, তাঁর দুটো কাব্যের নাম "নূরনামা" এবং "কায়দানি কেতাব"। "নূরনামায়" শেখ পরাণ বলেছেন :

ফাতেমাকে বিভা কৈল আলী মতিমান।।
নবীবংশে রচিছেন্দ সৈদ সুলতান।

শেখ পরাণও সৈয়দ সুলতানের নাম উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষ ছিলেন এমন কোন আভাস ইঙ্গিত পর্যন্ত শেখ পরাণ দেন নি। শাহ মীর মুহম্মদ শফী নামক আরেক জন কবি তাঁর 'নূরনামা' কাব্যে বলেছেন :

কহে মীর শাহসফী আমি দুঃখ মতি।
এহলোক পরলোক সেই দুরগতি।।
পিতামহ শাহসৈয়দ জানহ দরবেশ।
কিঞ্চিৎ জানাইলুঁ সেই পন্থের নির্দেশ।।

এই উক্তি থেকে ডক্টর শরীফ সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, কবির উল্লেখিত পিতামহ শাহ সৈয়দ আসলে সৈয়দ সুলতান। কিন্তু 'সৈয়দ' কেন 'শাহ' হয়ে গেলেন এবং পৌত্রই বা সৈয়দ ছেড়ে কেন শাহ মীর হয়ে গেলেন তার কোন ব্যাখ্যা জনাব শরীফ দেন নি। পীর সৈয়দ হাসান যে সৈয়দ সুলতানের পৌত্র তাঁর প্রমাণও এই প্রতাপশালী গবেষণাগ্রন্থে অনুপস্থিত। গবেষণাগ্রন্থ হলেও জনাব শরীফের অনেক আলোচনায় যেমন, এখানেও তেমনি, সিদ্ধান্তে উপস্থিত হবার ধরনটি বেশ আয়াসসাধ্য মনে হয়। ধরে নিলাম এঁরা কবির পৌত্র ও প্রপৌত্র, কিন্তু তা থেকে কবি যে চট্টগ্রামবাসী তেমন প্রমাণ জনাব শরীফ তাঁর আলোচনায় উদ্ধার করেন নি। তাঁর প্রদত্ত ছকেও সে প্রমাণ নেই, কোন সদুত্তরও নেই। অগত্যা জনাব শরীফের একমাত্র উদ্ধারকর্তা হিসেবে আমরা পাই একজন লিপিকরকে, নাম মুজফ্ফর। মুহম্মদ খানের "মোহাম্মদ হানিফার লড়াই" পর্বের লিপিকর মুজফ্ফর পুথির একস্থানে বলেছেন :

সুলতান দৌহিত্র হীন চক্রশালা ধর।
'কহে হীন মুজফ্ফরে এজিদ উত্তর।।
মুই হীন অধম যে বুদ্ধি ক্ষুদ্র কহি।
অশুদ্ধ হইলে শুদ্ধ ধীর করে ছহি।।

অন্যত্র হলে জনাব শরীফ লিপিকর প্রমাদ বলে এই লিপিকরকে বাতিল করতেন কিন্তু তাঁর নিজের প্রয়োজনেই জনাব শরীফের নিকট এই লিপিকর শ্রদ্ধার আসন পেয়েছেন। এখানে প্রশ্ন : এক, সুলতান নাম হলেই তিনি সৈয়দ সুলতান হবেন এমন প্রমাণ কোথায় ?

দুই, চক্রশালায় দৌহিত্র-এর ঘর হলেই একথা প্রমাণ হয় না যে সৈয়দ সুলতানের ঘরও সেখানেই ছিল। মাতামহ ও নাতির ঘর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একস্থানে নয়, কেবল নাতির পিতা ঘরজামাতা হলে ব্যতিক্রম ঘটে।

লালমতি সয়ফুল মুলুক কাব্যের কবি শরীফ শাহকেও ডক্টর শরীফ সৈয়দ সুলতানের দৌহিত্র বলে সিদ্ধান্তে এসেছেন। কবি শরীফ শাহ বলেছেন :

শাহ সুলতান সুত সর্বগুণে অলঙ্কৃত
তান পদে করিয়া ভকতি
কাজী মনসুর মানি তাহার তনয় জানি
শরীফ যাহার ভবতি।

আমরা অন্যত্র দেখেছি, সৈয়দ সহসা মীর শাহ হয়েছেন, এবার শাহ সুলতানের পুত্র কাজী মনসুর এবং তদীয় পুত্র শরীফ শাহ। মুসলমানদের বংশ পরম্পরায় এমন দ্রুত পরিবর্তন এবং গড়মিল শুধু বিস্ময়কর নয়, অবিশ্বাস্যও। অথচ ডক্টর শরীফ বিনাবাক্যে এই গড়মিল মেনেছেন এবং সিদ্ধান্তেও এসেছেন। সিদ্ধান্ত কোন তপস্যার ফসল নয়, যেন স্বপ্নে প্রাপ্ত কোন মন্ত্র। পরবর্তীকালে দেখবো গদা হোসেন হয়েছেন খোন্দকার। সৈয়দের পুত্র কাজী, কাজীর পুত্র শাহ, আবার খোন্দকার, এসবের ব্যাখ্যা ডক্টর শরীফের গবেষণায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, বিধায় তাঁর তথ্য ও যুক্তি বিবর্জিত বক্তব্য গ্রাহ্য হতে পারে না।

একমাত্র "ফায়েদুল মুকতদী" ও "গুলে বকাওলী" কাব্যদ্বয়ের কবি মুহম্মদ মুকিমের উক্তিতে সৈয়দ সুলতান যে চক্রশালার, তার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। কবি মুকিম বলেছেন :

এবে প্রণামিব আসি পূর্ব কবি জান।
পীর মীর চক্রশালা সৈয়দ সুলতান॥

এখানে "পীর মীর চক্রশালা" শব্দত্রয়ের পরে সৈয়দ সুলতানের ব্যবহার বিসদৃশ মনে হয়। সম্ভবত পীর মীর শব্দদ্বয়ের পর কোন একজন ব্যক্তির নাম ছিল এবং কবি সেই ব্যক্তি ও সৈয়দ সুলতান উভয়কেই প্রণাম জানিয়েছেন। পুথিটি আরো সযত্নে পড়ে দেখা দরকার এবং একাধিক পুথিতে চক্রশালা শব্দটি থাকলে তবেই এই পাঠ গ্রহণযোগ্য হবে, অন্যথা নয়। তা-ই বৈজ্ঞানিক রীতি। তাছাড়া কবি মুকিমের সময় সম্পর্কেও সন্দেহ আছে। ডক্টর শরীফ এই কবিকে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের কবি বলেছেন—যিনি মুকতদী কাব্যটি রচনা করেন ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে। কিন্তু তাঁর উক্তিতে আছে :

ইংরেজ নৃপতি সে যে ফিরিঙ্গির জাত
চিরদিন ইঙ্গরাজ এথা মহিপাল
ভালে ভাল মন্দে মন্দ তস্করের কাল।

আমরা জানি ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে পীট্স ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট পাশের পূর্ব পর্যন্ত কোম্পানীর শাসন ছিল অরাজকতায় পূর্ণ। লর্ড ওয়েলেসলী গভর্ণর জেনারেল (১৭৯৮-১৮০৫) হবার পর থেকে ব্রিটিশ ব্যুরোক্রেসী তাদের প্রশাসনের রজ্জুটি ধীরে ধীরে মজবুত করতে থাকে এবং বেণ্টিঙ্ক (১৮২৮-১৮৩৫) ও ডালহৌসীর (১৮৪৮-৫৬) সময় এই প্রশাসন সমগ্র

দেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করে—তারপর থেকে সমাজে সংস্কার সাধনের পথ প্রশস্ত হয়। কবি যখন বলেন "চিরদিন ইঙ্গরাজ মহিপাল" এবং ভালোয় ভালো, মন্দের মন্দ ও তস্করের সবচেয়ে বড় শত্রু, তখন বুঝতে হবে, কবির সময়ে ইংরেজ প্রশাসন অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এই উক্তির প্রেক্ষাপটে মুকিমকে উনবিংশ শতাব্দীর কবি বলাই বোধ করি অধিক সঙ্গত; "তাঁর ঋতু বেদ চন্দ্রশত আশী আর নয়" উক্তি সত্ত্বেও। আর তাই উনবিংশ শতাব্দীর একজন কবির উক্তি ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের কবির সময় ও বাসস্থান সম্পর্কে কতটা গ্রহণযোগ্য তা একবার ভেবে দেখা প্রয়োজন মনে করি। অর্থাৎ আমি বলতে চাই, মুকিমের দোহাই খুব বড় রকমের গুরুত্ব বহন করে না, যদিও ডক্টর এনামুল হক ও ডক্টর আহমদ শরীফ উভয়ের যুক্তিমালাই তাঁর ওপরেই প্রায় সর্বাংশে নির্ভরশীল।

মুহম্মদ খান সহ অন্য যে সব কবি সৈয়দ সুলতানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, সৈয়দ সুলতান যদি চট্টগ্রামের না হয়ে সিলেটের হন, তাতে সেই শ্রদ্ধা নিবেদনে কোন অসামঞ্জস্য দেখা দেয় বলে মনে করি না। সিলেটের সঙ্গে সেকালে চট্টগ্রাম ও রোসাঙ্গ রাজসভার যোগাযোগ যে ঘনিষ্ঠ ছিল, জল এবং স্থলপথে যাতায়াত ব্যবস্থাও যে স্বাভাবিক ও সহজ ছিল, এ-সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। যাঁরা সৈয়দ সুলতানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, তাঁরা সবাই যে চট্টগ্রাম অঞ্চলেরই কবি তা যেমন প্রমাণ সাপেক্ষ, তাঁদের সময়কাল যেমন সন্দেহাতীত নয়, তেমনি তাঁরা সবাই চট্টগ্রামের কবি বলে প্রমাণিত হলেও তাঁদের শ্রদ্ধাপূর্ণ বাক্য একথা প্রমাণ করে না যে, সৈয়দ সুলতান চট্টগ্রামের অন্তর্গত লস্করপুর বা চক্রশালার অধিবাসী ছিলেন। সিলেটের কবি ও পীরকেও চট্টগ্রামের কবিরা শ্রদ্ধা জানাতে পারেন, তার জন্যে কবিকে চট্টগ্রামেই যে হাজির করতে হবে, এমন কোনও প্রয়োজন দেখি না। বরিশালের কবি বিজয়গুপ্ত গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। বর্ধমানের কবি জয়ানন্দ নবদ্বীপ সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন না।

অধ্যাপক শ্রী যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সৈয়দ আবদুল আগফার চৌধুরী প্রণীত ১২৯৪ বঙ্গাব্দে (১৮৮৭ খ্রী.) প্রকাশিত "তরফের মতিহাস" তাঁর পূর্বপুরুষ স্থাপিত সদানন্দ ও জয়দুগা গ্রন্থাগারে সচ্চিদানন্দ সংগ্রহে রক্ষিত দেখেছেন এবং পরে এই পুস্তিকাটি দক্ষিণ কলিকাতার সন্তোষপুরে তাঁর নিজস্ব সংগ্রহে স্থান দিয়েছেন। আমি এখানেই পুস্তিকাটি আদ্যন্ত পাঠ করেছি। পুস্তিকাটি সৈয়দ সুলতান সম্পর্কিত আলোচনা-পর্যালোচনা আরম্ভের বহুপূর্বে প্রণীত। সুতরাং এই গ্রন্থে পণ্ডিতদের প্রয়োজন সিদ্ধের কোন রকম প্রভাব পড়ে নি। মরহুম বা স্বর্গীয় আগফার চৌধুরী নিজেদের বংশলতিকা ও বংশ সম্পর্কীয় তথ্য ধ্বংস হয়ে যাবে এই আশঙ্কায় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থাকারে তাঁদের নিজেদের বিবরণ প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন। সুতরাং ইতিহাস হিসেবে এর যে কোন মূল্যই নেই, এমন রায় দেওয়া অত্যন্ত দুরূহ। ডক্টর আহমদ শরীফ এই গ্রন্থটি পড়েন নি, পড়লেও তার নামোল্লেখের প্রয়োজন মাত্র অনুভব করেন নি। অথচ ডক্টর শরীফ তাঁর গ্রন্থে পীর গদা হোসেন বলে সৈয়দ সুলতানের এক বংশধরের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন, যিনি ফেণী অঞ্চলে রাজ্যস্থাপনকারী দুঃসাহসিক শমসের গাজীকে একটি ঘোড়া ও একটি তরবারী দিয়ে আশীবাদ করেছিলেন। ডক্টর শরীফ স্বীকার করেছেন যে, আরাকান রাজই কবি সৈয়দ সুলতানকে এই তরবারী উপহার দিয়েছিলেন এবং উল্লেখিত ঘোড়াটি কবিকে প্রদত্ত আরাকান রাজের ঘোড়াব উত্তরপুরুষ। দেখা যাচ্ছে, আগফার চৌধুরীর পুস্তিকায় সৈয়দ সুলতান আছেন, গদা হোসেন আছেন এবং তরবারী ও অশ্বও বিদ্যমান। সুতরাং ডক্টর শরীফ আগফার চৌধুরীকে যতটা উপেক্ষা করেছেন, তিনি তেমন উপেক্ষার পাত্র নন, বরঞ্চ তাঁর পুস্তিকাটি নিঃসন্দেহে বিবেচনার দাবী রাখে। ইতিহাস

পাঠে জানা যায় যে, শ্রীহট্টে গদা হাসন নগর নামে একটি পরগণা ছিল এবং সম্ভবত এর নামকরণ হয়েছিল গদা হোসেনের নামানুসারে। একাত্তর / বাহাত্তর বছর পূর্বে শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত" নামে যে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন সেখানে আগফার চৌধুরীর বংশীয় ইতিহাসটি শ্রদ্ধায় স্বীকৃতি লাভ করেছে। (শ্রী অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, পূর্বাংশ, ১ম ও ২য় ভাগ, ২য় ভাগ, ২য় খণ্ড, ৫ম অধ্যায়, প্রকাশক শ্রী উপেন্দ্রনাথ পাল, কলিকাতা ১৩১৭ বঙ্গাব্দে পৃ. ১০০-১১১) প্রসঙ্গত শ্রীযুক্ত স্বরূপচন্দ্র রায় কৃত "সুবর্ণ গ্রামের ইতিহাস" এবং শ্রী কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত "ত্রিপুরার ইতিহাস" ২য় ভাগ, ষষ্ঠ খণ্ড গ্রন্থদ্বয়ের কথা এখানে উল্লেখ প্রয়োজন। কেননা উভয় গ্রন্থেই তরফের সৈয়দ বংশের উল্লেখ আছে—ঈশা খাঁয়ের পিতা কালিদাস গজদানী এই সৈয়দ বংশের ইব্রাহিম-খালক-উল-উলামা-এর নিকট ইসলাম ধর্মে দীক্ষা লাভ করেন এবং ত্রিপুরার মহারাজা আরমাণিক্যের সঙ্গে প্রথমে বৈরিতার, পরে হৃদ্যতা-সম্পন্ন সম্পর্ক স্থাপিত হয় সৈয়দ বংশের সৈয়দ আদম নামক এক তরফদারের। আগফার চৌধুরীর পুস্তিকার সাথে এসব ঘটনার কোন গড়মিল নেই। গদা হোসেন ছাড়া ও হবি-গঞ্জের লস্করপুরান্তর্গত আরেকজন ব্যক্তির অস্তিত্ব আমরা লাভ করি, নাম সৈয়দ মুসা, যিনি সৈয়দ সুলতানের ভ্রাতা ছিলেন। কবি মুকিম প্রসঙ্গে ডক্টর শরীফও সৈয়দ সুলতানের ভ্রাতার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। কেননা মুকিমের কাব্যে আছে :

> সৈয়দ সুলতান বংশে শাহাদুল্লা নাম ॥
> একে তান ভ্রাতৃপুত্র দুতীয়ে জামাতা।
> সর্বশাস্ত্র বিশারদ শরীয়ত জ্ঞাতা ॥

মুকিমের বক্তব্য যে নির্ভরযোগ্য নয়, তা পূর্বে বলেছি। মুকিমের উক্তিতে উল্লেখিত এই ভ্রাতার নামই সম্ভবত সৈয়দ মুসা। সৈয়দ সুলতান যেমন আরাকান রাজের প্রীতিভাজন ছিলেন এবং তারই নিদর্শন স্বরূপ তিনি একটি ঘোড়া ও তরবারী উপ-ঢৌকন হিসেবে লাভ করেন, তেমনি তদীয় ভ্রাতা আরাকান রাজের অনুগ্রহ ভাজন ছিলেন। শ্রী শিবরতন মিত্র সংকলিত "বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক" গ্রন্থে (১৭ পৃ.) বলা হয়েছে যে, সম্ভবত ইনিই সেই সৈয়দ মুসা যাঁর অনুরোধে মহাকবি আলাওল 'সয়ফল মুলুক বদিউজ্জামাল' কাব্যটি লিখেছিলেন। এ-সম্পর্কে সুনিশ্চিত কিছু বলা অবশ্য কঠিন, তবে সৈয়দ মুসা নামে সৈয়দ সুলতানের একজন ভ্রাতা ছিলেন এবং তিনি আরাকান রাজের ঘনিষ্ঠতা লাভ করেন, এমন মনে করা যেতে পারে। সুতরাং হবিগঞ্জের লস্করপুরে আমরা তিনজনের অস্তিত্ব ঐতিহাসিকভাবে লাভ করেছি—সৈয়দ মুসা, সৈয়দ সুলতান এবং সৈয়দ গদা হোসেন। এই সৈয়দ পরিবারের সাথে দিল্লীর যোগাযোগ ও আত্মীয়তা সহজ হয়ে ওঠে এবং একদিকে আত্মিক সাধনা অন্যদিকে প্রশাসনে দৃঢ়তা ও ন্যায়বিচার উভয়বিধ কারণেই এই সৈয়দ পরিবার বাংলার সম্ভ্রান্ত ও কৃতি পরিবার গুলোর একটি হিসেবে দীর্ঘকাল খ্যাতিলাভ করে। চট্টগ্রামের পরাগল পুরে বা চক্রশালা চাকলার আধুনিক পটিয়ার কোন গ্রামে সমগ্র বাংলাদেশে খ্যাত ও দিল্লীর সঙ্গে এবং আরাকান রাজ ও ত্রিপুরাধিপতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোন সৈয়দ পরিবার ছিল কিনা তেমন প্রমাণ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ও ডক্টর আহমদ শরীফের পরিবেশিত তথ্যে অনুপস্থিত।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহও এই আলোচনায় প্রবেশ করেছেন। ডক্টর শহীদুল্লাহ লিপিকর মুজফ্‌ফরের উক্তিকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করে সৈয়দ সুলতানের নিবাস চক্রশালা বলে ধার্য করেন। জনাব মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন সাহিত্যরত্ন জনাব শহীদুল্লাহর এই মতের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করলে (মাসিক মোহাম্মদী, ২৪শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা) তিনি তরফের

ইতিহাস প্রসঙ্গটির উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, এই ইতিহাসে যে সৈয়দ সুলতান ছিলেন, তিনি ছিলেন প্রশাসক, তিনি যে কবি ছিলেন এমন প্রমাণ ইতিহাসে নেই। সুতরাং শ্রদ্ধেয় শহীদুল্লাহ সাহেব মনে করেন যে, কবি সৈয়দ সুলতান সিলেটের তরফের সৈয়দ সুলতান থেকে ভিন্ন এবং তাঁর নিবাস ও জন্মভূমি ছিল চট্টগ্রামের চক্রশালা চাকলার আধুনিক পটিয়ার কোন একটি স্থানে (মাসিক মোহাম্মদী, ১৩৫৯ সন, বাংলা সাহিত্যের কথা, পৃ. ২৯)। তাঁর ইতিহাস গ্রন্থেও জনাব শহীদুল্লাহ সৈয়দ সুলতানকে চট্টগ্রামাঞ্চলের কবি বলেই প্রতিপন্ন করেছেন (বাংলা সাহিত্যের কথা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৩)। শ্রদ্ধেয় শহীদুল্লাহর স্বভাবসুলভ উদারতা এখানে যে, তিনি তরফের ইতিহাসকে উড়িয়ে দেন নি। তবে সৈয়দ সুলতান প্রশাসক ছিলেন, কবি ছিলেন না এই মত তিনি ব্যক্ত করেছেন—অর্থাৎ তাঁর মতে সৈয়দ সুলতান দুইজন, একজন প্রসাশক, যাঁর আলয় সিলেটে, অপরজন কবি, যাঁর আলয় চট্টগ্রামে। ডক্টর শহীদুল্লাহর এই আপত্তির উত্তরে বলা যায় যে, কবি সৈয়দ সুলতান প্রশাসক ছিলেন বলেই বাংলা ভাষায় ইসলামী বিষয় বিশেষ করে নবীদের জীবনী প্রকাশে দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন। সেকালে বাংলা ভাষায় রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ লিখলে যেমন হিন্দু ব্রাহ্মণগণ রৌরব নরকে স্থান নির্দেশ করতেন, কৃত্তিবাস, কাশীদাসকে সর্বনেশে বলে চিহ্নিত করতেন, মুসলমান মোল্লারাও তেমনি আরবী থেকে পবিত্র কোরান বা নবীদের জীবনী প্রকাশকে কুফরী কাজ বলে মনে করতেন। সৈয়দ সুলতানের উক্তিতে তার প্রমাণ আছে :

এবে পুস্তকের কথা কহিতে জুআএ।
প্রকাশ্য সকল কথা মনে নাহি ভাএ।।
লস্কর পরাগল খান আজ্ঞা শিরে ধরি।
কবীন্দ্র ভারত কথা কহিল বিচারি।।
হিন্দু মোছলমান তাহা ঘরে ঘরে পড়ে।
খোদা রসুলের কথা কেহ না সোঙরে।।
গ্রহ শত রস যোগে অব্দ গোঙাইল।
দেশী ভাষে এই কথা কেহ না কহিল।।
আরবী ফার্ছি ভাষে কেতাব বহুত।
আলিমানে বুঝে, না-বুঝে মুর্খ-সুত।।
দুক্ষ ভাবি মনে মনে করিলুং ঠিক।
রছুলের কথা যত কহিমু-অধিক।।
লস্করের পুরখানি আলিম বসতি।
মুঞি মূর্খ আছি এক সৈয়দ সন্ততি।।
আলিমান পদে আমি মাগি পরিহার।
ক্ষেমিবা পহিলে দোষ না করি গোহার।।
ছৈয়দ সুলতানে কহে কেনে ভাবি মর।
সহায় রছুল যার তরিবে সাগর।।

বাংলা ভাষায় নবীবংশ রচনার ও প্রচারের কারণে কবিকে যে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, কবি অন্যত্রও তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন :

এত ভাবি নবীবংশ পাঁচালী রচিলুম।
আল্লা এক মনে ভাবি প্রচার করিলুম।।
তে কারণে কত কত পশুবুদ্ধি নরে।
কি ভাব ভাঙ্গিলুম করি দোষএ আমারে।।

সুতরাং সৈয়দ সুলতান একজন তরফদার ছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে এই সমালোচনাকে সামলানো সম্ভব হয়েছিল। সাধারণ লোকের পক্ষে এ কাজ দুরূহ ছিল। সৈয়দ সুলতানের পূর্ববর্তী কবি শাহ মুহম্মদ সগীরও এই ভীতির কথা উল্লেখ করেছেন :

চতুর্থে কহিমু কিছু পোথার কথন।
পাপ ভয় এড়ি লাজ দৃঢ় করি মন।।
নামা কাব্য কথা রসে মজে নরগণ।
যার যেই শ্রদ্ধায় সন্তোষ করে মন।।
ন লিখে কিতাব কথা মনে ভয় পাএ।
দোষিব সকল তাক ইহন জুয়া এ।।

[য়ূসুফ জলিখা কাব্য]

কবি মুজম্মিল বলেছেন :

আরবী ভাষায় লোকেঁ ন বুঝে কারণ।
সভানে বুঝিতে কৈলুঁ পয়ার রচন।।
যে বলে বলোক লোকেঁ করিলুঁ লিখন।
ভালে ভাল মন্দে মন্দ ন যাএ খণ্ডন।।

ডক্টর এনামুল হকও একথা স্বীকার করে বলেন : "কবি সৈয়দ সুলতান যে-সময়ে বাঙ্গলা ভাষায় সাধনা করিতেছিলেন সে-সময়ে শিক্ষা বিষয়ে বাঙ্গালী মুসলমানের অবস্থা শোচনীয় ছিল। আরবী ও ভাষাভিজ্ঞ আলিমগণ বাংলা ভাষা জানিতেন না। তাঁহারা বাংলাভাষাকে হিন্দু ধর্মের ভাষা বলিয়া অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন এবং ইসলাম ধর্ম-গ্রন্থাদিকে বা ধর্মের কথাকে বাংলা ভাষায় লিখিয়া প্রকাশ করা ধর্মদ্রোহিতা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।"—(সা. প. প. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২)। সৈয়দ সুলতান একটি তরফের মালিক ছিলেন—কবি ছিলেন এমন কথা তরফের ইতিহাসে নেই, তাই কবি বলে তাঁকে স্বীকার করা চলে না, শ্রদ্ধেয় শহীদুল্লাহর এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে উদ্ধৃতিসমূহ প্রদত্ত হলো। সৈয়দ সুলতান নামক একজন কবিকে আমরা পেয়েছি। তিনি লস্করপুরের মানুষ বলে নিজেকে উল্লেখ করেছেন, শ্রীহট্ট নগরের কথাও বলেছেন এবং তরফের ইতিহাসে সৈয়দ সুলতান আছেন, এসব কারণগুলো মিলিয়ে আমাদের বিচার করতে হবে যে, তরফের ইতিহাসে উল্লেখিত ব্যক্তিই কবি সৈয়দ সুলতান কিনা। যে-কারণে শ্রদ্ধেয় শহীদুল্লাহ হবিগঞ্জের সৈয়দ সুলতানকে ভিন্ন ব্যক্তি বলতে চেয়েছেন, যুক্তি হিসেবে তা খুব প্রণি-ধানযোগ্য নয়, বরঞ্চ একজন ক্ষমতাসম্পন্ন লোকের পক্ষেই গোঁড়ামির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বাংলা ভাষায় 'নবীবংশ' রচনা সম্ভব হয়েছিল বলে মনে করবার কারণ রয়েছে। বলা প্রয়োজন, তিনিই প্রথম মুসলমান কবি যিনি এই সৎসাহস দেখিয়ে ইসলাম-ধর্মকথা বাংলায় রচনা করেন। এদিক থেকে সৈয়দ সুলতান চট্টগ্রামের চক্রশালার একটি অখ্যাত স্থানের সাধারণ পরিবারের মানুষ ছিলেন এমন একটি দাবীর চেয়ে তিনি যে হবিগঞ্জের বাংলা ও ভারত বিখ্যাত সৈয়দ বংশের লোক ছিলেন এবং তরফের ইতিহাসে উল্লেখিত ক্ষমতাধর পুরুষ ও পীর সৈয়দ সুলতানই ছিলেন, সেই দাবীটিই তুলনামূলকভাবে অনেক জোরালো বলে মনে হয়। কবি নিজে বলেছেন লস্করপুর, অথচ সেই স্থানকে পরাগলপুর নামে রূপান্তরের কৃতিত্ব ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের। পরবর্তীকালে ডক্টর শরীফও লস্করপুরকে পরাগলপুর বলে চালিয়েছেন, তবে ব্যাখ্যা হিসেবে ডক্টর হকের একধাপ আগে তিনি অগ্রসর হয়েছেন। ডক্টর হকের ব্যাখ্যা তাঁর 'মুসলিম বাংলাসাহিত্য' (প্রথম মুদ্রণ, ১৯৫৭, পাকিস্তান পাবলিকেশনস, পৃ. ১৪৮) গ্রন্থে বিদ্যমান। সেই সুরে সুর মিলিয়ে ডক্টর শরীফও বলেন, "কবি পরাগলপুরে সাময়িকভাবে বাস করেছেন। বিশেষ

করে নবীবংশ শুরু করার সময় পরাগলপুরেই ছিলেন। তাই তিনি বলেছেন: 'লস্করের পুরখানি আলিম বসতি,/ মুঞি মূর্খ আছি এক সৈয়দ সন্ততি।' পরাগল খাঁ কর্তৃক পরাগলপুর পত্তনের ষাট-পঁয়ষট্টি বছর পরে সৈয়দ সুলতান 'লস্করের পুর' উল্লেখ করেছেন। এতে দুটো গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের ইঙ্গিত রয়েছে। এক, ১৫৮৪-৮৬ খ্রীস্টাব্দে পরাগলপুর অন্তত আঞ্চলিক শাসনকেন্দ্র ছিল। দুই, তখনো লস্কর বলতে প্রখ্যাত পরাগল খাঁই লোকস্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন। অথবা এই কেন্দ্রের শাসনভার তখনো লস্কর উপাধি কিংবা পদবীধারী কর্মচারীর উপর ন্যাস্ত ছিল। তবে শেষোক্ত অনুমানের অবকাশ অল্প। কেননা, আমাদের উদ্ধৃত চরণ দুটির আগেই কবি উল্লেখ করেছেন:

লস্কর পরাগল খান আজ্ঞা শিরে ধরি।
কবীন্দ্র ভারত কথা কহিল বিচারি॥

কাজেই লস্করের পুর যে পরাগল পুরই, তাতে সন্দেহ থাকে না।'' (প্রাগুক্ত গবেষণাগ্রন্থ)

কবি সৈয়দ সুলতানের 'লস্করের পুর' কে পরাগলপুর হিসাবে প্রতিপন্নের যে প্রয়াসে উপরোক্ত চট্টগ্রাম নিবাসী দুইজন পণ্ডিত গলদঘর্ম হয়েছেন, তাকে রীতিমত কষ্টকল্পনা বলে বিবেচনা করা যায়। উভয়ের এই প্রয়াসে মৌলিকতা আছে, কিন্তু তা-যতটা কল্পনা-স্পর্শী, ততটা বাস্তবধর্মী নয়। পরাগলখানের নাম কবি সৈয়দ সুলতান সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে উল্লেখ করেছেন, যাঁর প্রেরণায় কবিন্দ্র পরমেশ্বর গুপ্ত মহাভারত অনুবাদ করেছিলেন। তার মানে এই নয় যে, সৈয়দ সুলতান কবীন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন এবং পরাগলপুরের অধিবাসী তাঁকে হতেই হবে। সিলেট হবিগঞ্জের কবির পক্ষেও লস্কর পরাগলের এবং কবীন্দ্রের নামোল্লেখ সম্পূর্ণভাবেই সম্ভব এবং স্বাভাবিক একটি ঘটনা। এই সহজ ও স্বচ্ছ ব্যাপারটিকে নিয়ে এমন জট পাকানোর অর্থ এবং উদ্দেশ্য একমাত্র এই দাঁড়ায় যে, কবি সৈয়দ সুলতানকে চট্টগ্রামের কবি বলে প্রতিপন্ন করতেই হবে। অথচ কবি ঘুণাক্ষরেও কোথাও নিজবাসভূমি যে পরাগলপুর এ কথাটি বলেননি, বলেছেন লস্করের পুর, অর্থাৎ লস্করপুর, পয়ার ছন্দের ধ্বনি সামঞ্জস্যের জন্য হয়েছে লস্করের পুর। ডক্টর এনামুল হক এবং ডক্টর শরীফও কবি আলাওলকে নিয়ে এক সময়ে এমন জট পাকিয়েছিলেন। আলাওল বলেছেন:

গৌড়মধ্যে মুলুক ফতেহাবাদ শ্রেষ্ঠ।
বৈসও মহৎ জন সমাজ তেহ হৃষ্ট॥
বিজ্ঞজ দুনিয়াবন্ত খলিফা সুজান।
আউলিয়া সবের বহু তান গোরস্তান॥
হিন্দুকুলে শ্রোত্রীমন্ত্র ব্রাহ্মণ সুজন।
মধ্যে ভাগিরথীধারা বহে অনুক্ষণ॥
মজলিস কুতুব তথাত অধিপতি।
তাহান অমাত্য সুত মুঞি হীনমতি॥

[মৎ সম্পাদিত 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রাণী,' হরফ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৮০, আলাওল-কৃত অংশ, পৃ. ৭৬]।

আলাওলের এমন সুস্পষ্ট উল্লেখ সত্ত্বেও ডক্টর হক ও ডক্টর শরীফ বলেছেন যে, এই ফতেহাবাদ চট্টগ্রামের ফতেহাবাদ। আইন-ই-আকবরীতে উল্লেখ আছে যে, ৩১টি মহাল নিয়ে ফতেহাবাদ সরকার গঠিত হয়েছিল এবং এর রাজস্ব ছিল ৭৯৬৯৫৬৭ দাম। দিল্লী

সম্রাটের জন্য ফতেহাবাদ সরকারকে ৫০৭০০ পদাতিক সৈন্য এবং ৯০০ অশ্বারোহী সৈন্য যোগাতে হোত। ফরিদপুর জেলা সমেত যশোর, বাখরগঞ্জ, ঢাকা এমন কি নোয়াখালি জেলার অংশ বিশেষ এর অন্তর্গত ছিল। রিয়াজস সালাতিনের মতে বাংলার স্বাধীন সুলতান জালালুদ্দিন আবুল মুজফ্ফর ফতেহশাহের নামানুসারে ফতেহাবাদ নাম হয়েছে। কিন্তু অনেকে মনে করেন, ফতেহশাহ বা ফতেখাঁর নামে এই নাম হয়েছে। আলাওল যে মজলিস কুতুবের নাম করেছেন তিনি বারভুঞার বিদ্রোহের সময় যাঁরা স্বাধীনতার পতাকা তুলেছিলেন, তাঁদেরই একজন ছিলেন। মির্জানথনের বাহারিস্তান গৈবীতে আমরা তাঁর নাম পাই। পাঠান আমলে এখানে মুদ্রা অঙ্কিত হতো। এই ফতেহাবাদ সম্ভবত বর্তমান ফরিদপুর শহর নয়। ফরিদপুর শহর থেকে প্রায় চার মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে গেরদা বলে একটি গ্রাম আছে যার অনেক কীর্তিই পদ্মার কবলে নদীবক্ষে বিলীন হয়েছে। এই গ্রামে এবং চারপাশে যে আলাওল বর্ণিত ফতেহাবাদ ছিল এমন অনুমান বেশ জোরের সাথেই করা যায়। (শ্রী বিশ্বেশর ভট্টাচার্য, সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, চত্বারিংশভাগ, ১৩৪০, পৃ. ১১০)। এই স্থানই ছিল আলাওলের জন্মভূমি। চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার জোবরা গ্রামে আলাওলের নামে যে মসজিদ ও দীঘি আছে তা যে আল্লা রাস্তিখান নির্মাণ ও খনন করেন, এখন তা প্রমাণিত হয়েছে। আলাওলের জন্মের বহুপূর্বে সম্ভবত ১৪৭৩ খ্রীস্টাব্দে এই নির্মাণ ও খননের কাজ হয়। সুতরাং আলাওল সম্পর্কে যেমন ডক্টর হক ও ডক্টর শরীফের দাবী অসার প্রতিপন্ন হয়েছে, সৈয়দ সুলতান সম্পর্কেও উভয়ের দাবী যে একই প্রবণতা থেকে উৎসারিত, এতক্ষণের আলোচনায় আমি সে কথাই প্রতিপন্নের চেষ্টা করেছি। পরাগলপুর কষ্টকল্পিত একটি উপাখ্যান, চক্রশালার দাবীর ভিত্তিও মোটেই দৃঢ় নয়। অন্যপক্ষে লস্করপুর একটি প্রাচীন ঐতিহ্য সমৃদ্ধ স্থান, হবিগঞ্জে এই নামে এখনো একটি রেলওয়ে স্টেশন আছে। সৈয়দ সুলতান তাঁর জন্মভূমি হিসেবে এই নামের উল্লেখ করেছেন, শ্রীহট্ট নগরের উল্লেখ আছে তাঁর একটি গানে, তাঁর ভ্রাতা সৈয়দ মুহা, বংশধর গদা হোসেন, ঈশা খাঁর পিতার ধর্মান্তকরণ, আরাকান রাজের অশ্ব ও তরবারী, শমসের গাজীর প্রসঙ্গ, ত্রিপুরারাজের বৈরিতা ও হৃদ্যতা, শত বৎসর পূর্বে মুদ্রিত সৈয়দ আব্দুল আগফার চৌধুরী প্রণীত 'তরফের ইতিহাস', শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধির 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত', ইত্যাদি অভিনিবেশসহ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও বস্তুগত দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করলে এ-কথাই বলা সঙ্গত হবে যে, কবি সৈয়দ সুলতান সিলেট জেলার হবিগঞ্জের লস্করপুরেই জন্ম গ্রহণ করেন, চট্টগ্রামের পরাগল পুরে নয়।

মুহম্মদ আসাদ্দার আলী "সিলেটের মহাকবি সৈয়দ সুলতান" প্রবন্ধে মূল্যবান তথ্য ও যুক্তি পরিবেশন করেছেন। সৈয়দ সুলতানের ভাষায় চট্টগ্রামের চেয়ে যে সিলেটি আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্য অনেক বেশী, জনাব আলী তার প্রচুর প্রমাণ তুলে ধরেছেন। যেমন ডুব বা ডুবাইব অর্থে সৈয়দ সুলতানে আছে বোর, বোরাইমু—এমন প্রয়োগ চট্টগ্রামে নেই; আছে ডুম, ডুমযম। ঢাকিয়া চটগ্রামে ঢাকি বা ঢাকেয়া; সিলেটে ঘুরি বা ঘুরিয়া, সৈয়দ সুলতানেও ঘুরি বা ঘুরিয়া আছে। আমি মনে করি, জনাব আলীর প্রবন্ধটি, ঢাকার কোন ডাকসাইটে পত্রিকায় প্রকাশিত না হলেও, খুবই তথ্য ও যুক্তিনিষ্ঠ এবং তাই বিশেষ বিবেচনার দাবী রাখে। ভাষার ক্ষেত্রেও সৈয়দ সুলতানের ওপর সিলেটের দাবী যে অনেক বেশী, একথা সুস্পষ্ট। সৈয়দ সুলতানকে এসব কারণে সিলেটস্থ হবিগঞ্জের লস্করপুরের অধিবাসী হিসেবে চিহ্নিত করাই অধিক যুক্তি সঙ্গত মনে করি। ডক্টর হক ও ডক্টর শরীফের গুরুতুল্য জনাব আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদও এই যুক্তি গ্রহণ করেছেন। ১১-৮-৪৯ তারিখে অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যকে তিনি একটি পত্র লিখেন। কতকগুলো ছোট কাগজ, যা অকেজো, একত্র আঠা দিয়ে জোড়া দিয়ে তিনি একটি পূর্ণ পৃষ্ঠা তৈরী করে তার মধ্যে তাঁর বক্তব্য লিখেছেন। আমি শ্রীভট্টাচার্যের

বিরাট সংগ্রহশালায় এই পত্রটি দেখেছি এবং পড়েছি। জনাব সাহিত্য-বিশারদ সৈয়দ সুলতান সম্পর্কে অধ্যাপক ভট্টাচার্য যে সব যুক্তি প্রদর্শন করেন, তা সমর্থন করে লিখেছেন, "কুমিল্লার আলী আহম্মদের তালিকা আমি দেখিয়াছি, উহা সুলিখিত হয় নাই। সম্প্রতি তিনি ওফাতে রসুল নামক পুঁথি প্রকাশ করিয়াছেন, আপনি দেখিয়াছেন কি? তাঁহার গবেষণার ও পাণ্ডিত্যের বহর দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। সৈয়দ সুলতানের সঠিক পরিচয় আপনা কর্তৃক প্রকাশিত হইবার পরও তাঁহার পরিচয় সম্বন্ধে এত কথা বলিতে যাওয়া গবেষণাশক্তির অপব্যবহার মাত্র। তারপর তিনি প্রাচীন বানান হুবহু রক্ষা করিয়াছেন। সেকালের লিপিকারেরা বানানের কোন ধার ধারিতেন না। কলমের আগায় যাহা আসিত, তাঁহারা তাহাই লিখিয়া যাইতেন। তাঁহাদের অজ্ঞতাকে সেকালের প্রচলিত ভাষা মনে করিবার কোন হেতু আমি দেখি না।"

সর্বজন শ্রদ্ধেয় সাহিত্যবিশারদের নিকট যা গবেষণাশক্তির অপব্যবহার মাত্র, অনেকের নিকট তা-ই পাণ্ডিত্যের প্রধান অবলম্বন। এ-কারণেই লস্করপুর পরাগলপুর হয়, ফতেহাবাদ ফরিদপুর থেকে হয় স্থানান্তরিত।

ডক্টর সুকুমার সেন সৈয়দ সুলতানের "গ্রহ শতরস যোগে" এই উক্তিকে "দশ শত রস যুগ" ধরে ১৬৬৪-৬৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁর "নবীবংশ" রচনারম্ভের কাল বলে নির্ণয় করেছেন। (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অপর, ১৯৬৩, ৩য় সং, পৃ. ৩৪৩)। কিন্তু মুহম্মদ খান সৈয়দ সুলতানকে গুরু বলে স্বীকার করেছেন, তাঁর সময়কাল আনুমানিক ১৫৮০-১৬৫০ খ্রীস্টাব্দ ধরা হয়েছে। ডক্টর শরীফ "গ্রহ শত রস যুগে" এই পাঠ ধরে কবির নবীবংশ রচনায় হাত দিবার সময় ১৫৮৪-৮৬ খ্রীস্টাব্দ বলে স্থির করেছেন। কিন্তু গ্রহ শত রস যোগে ধরলে অনেকগুলো হিজরী সন পাওয়া যায়—এতে সমস্যার এমন সহজ সমাধান হয় না। তাই জনাব শরীফ নির্ণীত ৯৯১-৯৪ হিজরী অর্থাৎ ১৫৮৪-৮৬ সাল যে কাব্যরম্ভের কাল নয়, এমন অনুমানই যথার্থ মনে করি। কবি তাঁর উক্তিতেও বলেছেন যে, এই সময়টি পার হয়ে গেল, অথচ কেউ মুসলমানী গ্রন্থে হাত দিচ্ছেন না। জনাব আসাদ্দার আলী এই 'গ্রহ শত রস যুগে' বলতে মঘীসন ধরে বিচার করে ১৬৩০-১৬৩২ খ্রীস্টাব্দ পেয়েছেন এবং এই সময়টিকে নবীবংশ রচনার আরম্ভকাল বলে উল্লেখ করেছেন। ডক্টর এনামুল হক এবং ডক্টর শরীফ উভয়ই হিজরী সন ধরে বিচার করেছেন। কবি সুলতান যে হিজরী সনেরই ইঙ্গিত করেছেন, তার কোনরূপ নিশ্চয়তা নেই। এই সন মঘীসনও হতে পারে, কেননা সে সময়ে মঘীসন সমগ্র আরাকান ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিশেষ করে প্রচলিত ছিল। কবি মুহম্মদ খানের বিখ্যাত কাব্য "মকতুল হোসেন" রচনার কাল ১৬৪৫ খ্রীস্টাব্দে ধরা হয়েছে—এর পূর্বে অর্থাৎ ১৬৩০-৩২ খ্রীস্টাব্দে শুরু করে ১৬৩৫-৩৮ খ্রীস্টাব্দের দিকেই সৈয়দ সুলতান তাঁর নবীবংশ সমাপ্ত করেছেন, এমন অনুমান যথার্থ বলে মনে করা যেতে পারে। ১৬৪৫ খ্রীস্টাব্দে সৈয়দ সুলতানের অসমাপ্ত কাজের অর্থাৎ কারবালার কাহিনী অংশের রচনার দায়িত্ব সৈয়দ সুলতান শিষ্য মুহম্মদ খানকেই দিয়েছিলেন—সম্ভবত তখনো তিনি জীবিত ছিলেন, তবে বৃদ্ধ। এ থেকে অনুমিত হয়, সৈয়দ সুলতান আলাওলের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং প্রায় সমসাময়িক পূর্ববর্তী কবি ছিলেন আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যের রচনাকাল ১৬৪৫-১৬৫২ খ্রীস্টাব্দ। অন্যপক্ষে দৌলত কাজীর সতীময়না ও লোরচন্দ্রানীর রচনাকাল ১৬৩০-৩৮ খ্রীস্টাব্দ। আমার মনে হয়, রচনাকাল হিসেবে সৈয়দ সুলতানের নবীবংশ সম্ভবত সতী ময়নার সমসময়ের। সৈয়দ সুলতানের সময় নিরূপণের ব্যাপারে ও ডক্টর এনামুল হক ও ডক্টর শরীফ যেমন সুনিশ্চিত বিশ্বাসে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা সমীচীন বিবেচিত হতে পারে কিনা, সে কথাও অবশ্যই বিচার সাপেক্ষ। আমি সৈয়দ সুলতানের স্থান কাল সম্পর্কিত উভয় পণ্ডিতের মতবাদের সাথে একমত হতে পারি নি বলেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।